প্রথম অধ্যায়

প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা

জাতির গৌরবময় ইতিহাস না থাকাকে বঙ্কিমচন্দ্র কলঙ্ক মনে করতেন। একথা ঠিক উনিশ শতকে পদার্পণের মুহূর্তে চৈতন্যদেব বা রঘুনন্দন মতো দু'একজনের ইতিহাস ব্যতীত বাঙালীর নিকট গৌরবের ইতিহাস ছিল না। বাঙালী সমাজে ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখা গিয়েছিল। অথচ উনিশ শতকে এই বাঙালী ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। উনিশ শতকের শেষে দেশে এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। আমরা লক্ষ করব—স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩) শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে দেশীয় হিন্দু ধর্মের গৌরব স্বীকৃতি আদায় করেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উনিশ শতকেই বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা বঙ্গমায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এছাড়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই শতকেই বাংলা সাহিত্যও নব নব রূপ, রীতি ও রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্ম ভাবনামূলক কাব্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান, উনিশ শতকে 'নৈবেদ্য' (রচনাকাল ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যে তার সূত্রপাত। অতএব উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ তার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে পৃথিবীর পটভূমিতে যোগ্যতা প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছে। এই অধ্যায়ে দু'টি বিষয়কে স্পষ্ট করা হবে,যথা — উনিশ শতকে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির পূর্বে বাঙালীর কিরূপ অবস্থা ছিল ও প্রাক্ উনিশ শতকের সংকীর্ণ সমাজ চেতনার সঙ্গে উনিশ শতকের উদার সমাজ চেতনার পরম্পরার সূত্রটি স্পষ্ট করা।

আমরা প্রথমে প্রাক্ উনিশ শতকের সমাজ ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজের প্রকৃত চিত্র কেমন ছিল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে,সমাজ কি? পরস্পরের সহযোগিতায় বসবাসকারী সংঘকে সমাজ বলা যেতেপারে। মানব সমাজ বলতে মানুষের সংঘকে বোঝায়। অন্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার মতো নানা রীতি-নীতি সমাজে প্রচলিত আছে। এই রীতি-নীতিগুলিকে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি সদস্যকে মেনে চলতে হয়। কেননা, সমাজে একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। সে কারণেই মানুষ সমাজ গড়েছে। সমাজে ভালোভাবে বসবাস করার জন্য সমাজপতিদের ভাবনার অন্ত নেই। সেজন্য মানব সমাজ প্রচলিত রীতি-নীতিকে কঠোরভাবে পালন করে। কেননা এই সব রীতি-নীতি মানব সমাজ থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কঠোরভাবে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতিকে পালন করতে গিয়ে অনেক

সময় সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিরপেক্ষভাবে দেখলে মনে হয়, এই সংকীর্ণতাই সমাজের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। প্রাক্ উনিশ শতকে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তুলনায় বলবান ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা। দেশীয় সমাজের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক এই সংকীর্ণ মানসিকতা। এই সময় ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এসেছে অবক্ষয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষালাভ করে রাজা রামমোহন রায়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ জাতীয় জীবনের দুরবস্থা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের মতো প্রাচীন সভ্য দেশে কি কারণে অধঃপতন নেমে এলো 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন এদেশে সভ্যতা বিনাশের মূলে রয়েছে 'প্রকৃতি' ও এদেশেরই অতিউন্নত দর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র দর্শন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন;—

> "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরনীয়।" (১)

এদেশে ঐহিক সুখ নিন্দনীয় হওয়ায় মানুষ ঐহিক সুখ লাভে বিরত হয়। তাতে দেশের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। অতএব ভারতের দুরবস্থার মূলে দেশের প্রকৃতি ও উন্নত দর্শন উভয়ই সমান দায়ী। স্বদেশের সভ্যতার চরম উন্নতির পরেই যে অধঃপতন শুরু হয়েছিল, প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালীর অধঃপতন তার চূড়ান্ত রূপ।

আমাদের সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক। এদেশ এক সময় ধর্ম বিষয়ে চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয়েছিল। অথচ এই দেশে ধর্মের অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষ বেশী প্রভাবিত হল। প্রাক্ উনিশ শতকে এদেশে যা চূড়ান্ত আকার পেল। এই ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল নিম্নবর্ণের মানুষগুলি ও নারী সমাজ। মূল ধর্মের অনুশাসনের পরিবর্তে এদেশের উচ্চবর্ণ সম্প্রদায় নিম্নবর্ণ ও নারী সমাজের জন্য নতুন অনুশাসন প্রবর্তন করল। অশিক্ষিত নিম্নবর্ণ ও নারী সমাজ ধর্ম বা পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে উচ্চ বর্ণ নির্দেশিত আচার-আচরণ পালনে যত্নবান হয়। প্রাক্ উনিশ শতকে অধিকাংশ বাঙালী ধর্ম বলতে জাতপাত, পূজা-পার্বন, আচার-আচরণকেই মনে করত। ঐতিহাসিক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশের বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা;—

> "বৈশাখ—প্রাতঃ স্নান, ব্রাহ্মণকে জলঘটদান, মসূরসহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষ্ণুকে শীতলজলে স্নান করান।
>
> জ্যৈষ্ঠ—অরণ্যষষ্ঠী, সাবিত্রীব্রত ও দশহরা।
>
> আষাঢ়—চাতুর্মাস্য ব্রত।

শ্রাবণ—মনসাপূজা।

ভাদ্র—জন্মাষ্টমীব্রত ও অনন্তব্রত।

আশ্বিন—দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

কার্তিক—প্রাতঃস্নান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উল্কাদান প্রভৃতি; দ্যূতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

অগ্রহায়ণ—নবান্নশ্রাদ্ধ।

পৌষ—এই মাসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ—রটন্তীচতুর্দশী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান ও সূর্যোপাসনা, বিধানসপ্তমীব্রত, আরোগ্যসপ্তমীব্রত, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মপূজা।

ফাল্গুন—শিবরাত্রিব্রত।

চৈত্র—শীতলাপূজা, বারুণীস্নান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দশী তিথিতে পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত বিপথ হইতে ত্রাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে, এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।" (২)

প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ এইসব আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলত। ধর্মপ্রাণ বাঙালীজাতি মনে করত এই সবই হল পূণ্য বা ধর্ম লাভের পথ। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল ধর্মান্ধ। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতার বিষয়ে বলা হয়েছে;—

"দুইটি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। প্রথমতঃ, এই দুই সংস্কৃতিই ধর্মকেন্দ্রিক এবং দুইয়ের মধ্যেই ধর্মান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উভয় সমাজেই প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানই ধর্মের স্থান অধিকার করিত—কোনরূপ যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বড় একটা ছিল না। হিন্দু সমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন, চড়ক প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা এবং বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও কৌলিন্যপ্রথার বিষময় ফল লোকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছে, স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হইলেই তাহাদের বৈধব্যদশা ঘটিবে ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের কঠোর পর্দার ব্যবস্থা নির্বিচারে অনুসৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মোৎসব দুর্গাপূজা ধনীর গৃহে জাঁক- জমক, নৃত্য-গীত ও পান-ভোজনের উপলক্ষ মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই শিক্ষা ও জ্ঞানের গণ্ডী প্রায় ধর্ম বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।"(২)

উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনাচরণের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব, যুক্তি নির্ভরতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার মতো ইতিবাচক গুণ। প্রাক্ উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই যা থেকে অনেক দূরে থাকতো। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান সম্প্রদায়ও অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে যায়। ধর্মান্ধতার কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভেদাভেদ তৈরী হয়। উন্নত দেশ বা জাতি গঠনের পক্ষে যা মোটেই অনুকূল নয়।

প্রাক্ উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালী সমাজ পূজা-পার্বণ, ব্রত উপাসনাকেই ধর্ম বলে মনে করত। এই আচার-আচরণ সর্বস্ব সমাজে নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর ও উদার চিন্তাচেতনার অস্তিত্ব ছিল না। উনিশ শতকেও হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শ পরব্রহ্মের উপাসনা, সর্বভূতে দয়া, মহৎ ত্যাগ, নিষ্কাম কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রভৃতি মহৎ নীতি ও উপদেশের চেয়ে আচার আচরণ রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণই ধর্ম বলে পরিচিত ছিল। সে কারণেই রাজা রামমোহন রায় দেশের মানুষের ধর্মান্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার' প্রভৃতি অনুবাদ করে বাঙালী সমাজে প্রথম ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করেন। আমরা লক্ষ করব — রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বদেশবাসীর ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত একটি চিঠিতে বলেন;—

> "এখনকার হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়— ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি?" (৪)

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার সমাজ চিত্রের কথা বলেছেন। মনে রাখতে হবে, এই সমাজকে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যুগচিন্তা নায়কের আবির্ভাবের পরেও আপামর বাঙালী সমাজ প্রকৃত ধর্মকে বুঝতে পারে নি। প্রাক্ উনিশ শতকে তাহলে আরো কত অজ্ঞতা ছিল—তা আজকে ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে — আমাদের সমাজ ধর্ম-কেন্দ্রিক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের থেকে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। এদেশে চরম অধঃপতন নেমে আসতে পারে ধর্মীয় আচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে। তবে ধর্মীয় জীবনাচরণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। কিন্তু ধর্মীয় দর্শনের অপব্যাখ্যা সমাজে প্রচলিত হয়। এদেশের সাধারণ মানুষ শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যাকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। এখানে অবশ্যই প্রশ্ন হতে পারে, ধর্মকেন্দ্রিক দেশের মানুষগুলি শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা নির্বিচারে গ্রহণ করল কেন? বলা যায়, কোন উপায় ছিল না। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। যে শাস্ত্র পাঠ করে অর্থ গ্রহণ করে এমন ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্ণের পণ্ডিতকুল স্বেচ্ছাচারী হয়। অর্থাৎ

প্রাক্ উনিশ শতকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়ে যায়। ভেদাভেদ বা বৈষম্য ছিল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে এবং পুরুষ ও নারীতে। মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রাক্ উনিশ শতকে প্রকট হয়ে ওঠে। বর্ণবৈষম্যের বিষয়ে 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে;—"হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই চারিবর্ণের জন্যই বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস স্মৃতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ উচ্চতম বর্ণ।" (৫) প্রাক্ উনিশ শতকে এই বর্ণবৈষম্য প্রথা নির্বিরোধে মেনে চলা হত। অথচ প্রাচীনকালে এই বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা ছিল না। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে 'মনুসংহিতা'র শ্লোক উদ্ধার করে লিখেছেন;—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতিশূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবনন্তু বিদ্যাৎবৈশ্যাত্তথৈবচ।।" (৬)

অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম। অতএব প্রাচীন ভারতে উচ্চ বর্ণের সন্তান কর্মগুণের অভাবে শূদ্র হত এবং শূদ্র সন্তানও কর্মগুণে ব্রাহ্মণ হতে পারত। সমাজে উচ্চবর্ণের পদ লাভ করার জন্য একটি প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। বলা যায়, ভারতবর্ষের অবনতির অন্যতম একটি কারণ এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই প্রতিযোগিতার অভাবে প্রাক্ উনিশ শতকে এদেশ চরম অধঃপতন দশা প্রাপ্ত হয়।

নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল। অতএব নিম্নবর্ণের মতো নারীও তুলনায় বলবান ও বুদ্ধিমান পুরুষ সমাজের দ্বারা নির্যাতিত হয়। বুদ্ধিমান পুরুষ সমাজ ধীরে ধীরে নারীর সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এবিষয়েও 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্ উনিশ শতকের নারীর স্থান বিষয়ে লিখেছেন —

> "বৈদিক যুগে শাস্ত্রাদির চর্চা এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বহু ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী-ঋষির নাম ও তাঁহাদের নামাঙ্কিত সূক্তাদি পাওয়া যায়। উপনিষদেও বিদুষী মহিলাগণ পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া জানা যায়। পরবর্তীকালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'তেই বলা হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্‌ভাবে করণীয় কোন যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাঁহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাঁহার যেন কোন সত্তাই নাই।" (৭)

সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মনুসংহিতার নির্দেশিত পথে পুরুষ নারীকে দাসীতে রূপান্তরিত করেছিল। প্রাক্ উনিশ শতকে এই প্রথা অপরিবর্তিত থাকায়— নারী চরম নির্যাতিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়—পুরুষের বহুবিবাহ

প্রথা, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ও বর্বর প্রথার দ্বারা নারী অত্যাচারিত হত। সে জন্যই উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

সমাজে ধর্ম বিষয়ে, জাতিভেদ বিষয়ে, নারী বিষয়ে যে প্রথা প্রচলিত হয়েছিল— সেগুলি প্রাক্ উনিশ শতকে কঠোরভাবে পালন করা হত। যে সমাজ ধর্ম বিষয়ে, বর্ণভেদ বিষয়ে বা নারী বিষয়ে সংকীর্ণ প্রথা প্রচলন করে, সেই সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প বিষয়ে ভাবার অবকাশ পায় নি। সমাজে যারা শ্রমোপজীবী তারা অক্লান্ত কায়িক শ্রমের দ্বারা কোনরকমে জীবনধারণ করত। এবং যারা উচ্চবিত্ত, তারা ভোগবিলাসে মগ্ন হত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার মতো মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করলে যে মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তা এদের ছিল না। ফলে প্রাক্ উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে অনিবার্যভাবে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে।

এখন প্রশ্ন, উনিশ শতকের গোড়া থেকে স্বদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁরা আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াস করেছিলেন, উনিশ শতকে তাঁদের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় প্রাক্ উনিশ শতকের ধারাবাহিক ধর্মান্ধতার মধ্যে উনিশ শতকে আকস্মিকভাবে উদার ও নিরপেক্ষ চিন্তা চেতনার প্রকাশ কি ভাবে সম্ভব হল।

এদেশের অধিকাংশ মানুষই অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত — যারা রাজনীতি ও অন্যান্য মানসিক পরিশ্রম বিষয়ক সূক্ষ্ম চিন্তাশীল বিষয় থেকে দূরে থাকত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, এর ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অবনতি এসেছে। মধ্যযুগের অন্তিমেও বাংলা দেশের সাধারণ প্রজাদের এই চেতনাহীনতা ও দুর্বলতার সুযোগে দেশীয় অভিজাত ও রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী এবং ভোগলিপ্সু হয়ে উঠে। যা সহজলভ্য তাকে পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা বৃথা। বলা যায় এদেশের প্রজাদের সরলতার জন্যই দেশীয় রাজপুরুষ ও অভিজাত সমাজ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণে তারা অনায়াসেই ভোগ, লিপ্সা, অপশাসন ও অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে;—

> "পলাশির যুদ্ধের সময় মুসলমান নবাবদের রাজ্যশাসন প্রথা এবং দরবারের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুর্নীতি অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই অযোগ্য ও অসৎ এবং রাজ পরিবারের অধিকাংশের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপই ছিল। ...বিলাস ব্যসন ও ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই নবাব ও তাহাদের অনুচরদের একমাত্র কাম্য ছিল — নারী ও সুরাই ছিল তাহাদের নিয়ত সঙ্গী। সিরাজউদ্দৌল্লা, মীরণ প্রভৃতির প্রকৃতি এমন ছিল যে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সর্বদাই ভয়ে তটস্থ

থাকিত। ফলে সৈন্যরা ছিল অপদার্থ ও অকর্মণ্য এবং নবাবের বিরুদ্ধে অহরহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল।...নবাব দরবারের এই কলুষতা যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজকেই কতকটা দূষিত করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (৮)

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় (১৭০৭) ভারবর্ষের শেষ শক্তিশালী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতা ক্রমশ প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা দেয় অরাজকতা, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতকে এরকম রাজনৈতিক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় বণিক জাতি জমিয়ে বাণিজ্য করে চলছিল। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় বণিক অচিরেই বুঝতে পারে — এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা খুব কঠিন নয়। দেশীয় সমাজের এই কলুষতা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় কারণ।

অবশ্য ভারতের মতো একদা ইউরোপেও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে নবজাগরণের ফলে অনেক দিন আগেই ইউরোপ অচল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার গুটি কেটে বেরিয়ে প্রগতিশীল ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর তাই অনেকেই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি চর্চা করেছিলেন। কেউবা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের নেশায়, আবার কেউ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য উপনিবেশ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইউরোপে রেনেসাঁর অনেক আগে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত অভিযান করেন। তারপর বিভিন্ন কারণে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ ছিন্ন হয়। কিন্তু নবজাগরণের নতুন উদ্যোমে নাবিক ভাস্কো-দা-গামার চেষ্টায় জলপথেও ভারত আবিষ্কৃত (১৪৯৮) হয়। নবজাগরণের ফলে সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মনে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহজতম কৌশলটি পেয়ে বসে। ফলে পোর্তুগীজদের পর একে একে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো ভারতেও আসে। এইসব ইউরোপীয়রা বুঝেছিল, পৃথিবীর অন্যতম সার্বভৌম শক্তি হল—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এই সার্বভৌম শক্তিকে অর্জন করতে ইংরেজ ও ফরাসী জাতির মনোমালিন্য চোখে পড়ার মতো। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ফরাসীরা পিছিয়ে পড়লে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো এদেশেও ইংরেজ জাতি প্রতাপশালী হয়ে উঠে। এবং সেই সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের দীর্ঘদিনের সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ নবাব-বাদশার শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার একটি পথ তৈরী হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামাতো না। দেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজকীয়কার্যে ও রাজনীতিতে খুব সামান্য কয়েক জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময়ে তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি অনেকেই

অসন্তুষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা বয়সে নবীন, চরিত্র ছিল অনেকটা ভোগলিপ্সু বিলাসী ও দাম্ভিক প্রকৃতির। সিরাজের আত্মীয় পরিজন অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে ঈর্ষান্বিত ও অনিষ্ট কামনায় মত্ত। সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন —

> "কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মাতামহের কাছে থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবর্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে সিরাজের লেখাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাসক্ত, উদ্ধত, দুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবর্দী সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। ...ঘসেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে ছিলেন।" (৯)

সিরাজের সিংহাসন লাভকে আত্মীয়-পরিজন মেনে নিতে পারে নি। এরকম একটি বিপদসঙ্কুল পরিবেশে সিরাজদ্দৌলার অহং-ভোগলিপ্সু-বিলাসী চরিত্র তার চারপাশে একটি বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যা এদেশে পাশ্চাত্য শাসনের গোড়াপত্তনে একটি কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

এই বিরোধী মঞ্চে আর একটি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে সমাজ হল দেশীয় হিন্দু অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজ দেখল মুসলিম অভিজাত সমাজ অপেক্ষা এমনকি নবাব অপেক্ষা বিদেশী বণিকদের বৈভব ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী। সামান্য বণিক হয়েও এরা অনেক বেশী সুশৃঙ্খল। এরা বিভীষিকাময় বর্গী আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি নবাবের অদেশকে বিনা বিবেচনায় মেনে নেয় না, প্রয়োজনে অমান্য করার সাহস দেখায়। এইসব নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের প্রতি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে। নবাবের বিকল্প শাসক হিসাবে বণিকদের গ্রহণ করতে এদের অনেকের দ্বিধা হয় নি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন —

> "বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। ...এইরূপ মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙ্গালী জনসাধারণও উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিত।" (১০)

এর একটি সুদূরপ্রসারী কারণ রয়েছে। অধিকাংশ বাদশাহদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে গভীর আস্থা ছিল। পাশাপাশি ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব থাকায় হিন্দু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তুষ্ট ছিল। বৃটিশ রাজত্বে সন্তুষ্ট প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মনে করতেন;— "হিন্দুদের সর্ববিধ দুঃখ দুর্দশা ও অবনতির মূল কারণ মুসলমান রাজ্যশাসন

নীতি।"[১১] এজাতীয় মনোভাব শুধু দ্বারকানাথ ঠাকুর নামক একজন ব্যক্তির নয়, উনিশ শতকের অনেক সচেতন ব্যক্তি এজাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বা রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মানুষ। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অর্ধশত বৎসরের মধ্যে এঁদের জন্ম। ইংরেজ রাজত্বের অর্ধশত বছরের পরেও এঁরা মধ্য যুগের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে যারা মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে ছিলেন, মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের খুব একটা প্রভেদ হবে বলে মনে হয় না। অতএব অষ্টাদশ শতকের সচেতন মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী নবাব-বাদশার শাসনের অবসান চাইবেন—এটা অস্বাভাবিক নয়।

বলা যায়, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মূলে নবাব সিরাজদ্দৌলা যেমন দায়ী তেমনি তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকাংশ রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্র ও বিদেশী বণিকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সমর্থন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব থেকে উক্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার যে অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, রাজত্ব প্রাপ্তির পর সেই সহযোগিতা আরো পূর্ণ উদ্যোমে চলতে লাগল। এবার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ বণিক রাজাদের স্বাগত জানিয়ে বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। এবং এরা হয়ে উঠল বৃটিশরাজ সমর্থন পুষ্ট নাগরিক সমাজ। পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথম দিকে বণিক রাজাদের আন্তরিকভাবে মেনে নিতে না পারায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য সর্বোপরি আধুনিক জীবনকে বয়কট করে পিছিয়ে পড়তে লাগল। অর্থাৎ উনিশ শতকের পূর্বেই হিন্দু সমাজের একটি অংশ ও বণিক রাজার পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী এবং শিক্ষিত ও সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ডঃ অতুল সুর এবিষয়ে লিখেছেন;—

> "সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল অপরদিকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক নূতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল দেওয়ান, বেনিয়ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার,দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। শহরটা এই রূপান্তরিত সমাজেরই যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবির্ভূত হয় মুষ্টিমেয় ধনী, যাদের 'বাবুসমাজ' বল হত, যারা রাত্রে নিজ গৃহে থাকাটা মর্যাদার হানিকর মনে করত ও রাত্রিটা বারবনিতার ঘরে কাটাত, আর নীচের দিকে ছিল সাধারণ লোক—সাহেবরা যাদের বলত "ভদ্দর লোক"। এই সমাজের শীর্ষে বিলাসিতা ও জাঁকজমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীরা, আর সাধারণ লোক

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে এক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষিত শ্রেণীই প্রতিবাদ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে। সহমরণ বন্ধ হয়ে গেল (১৮২৯), বিধবাবিবাহ পেল আইনের স্বীকৃতি (১৮৫৬), সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া রুদ্ধ হয়ে গেল (১৮৩০), দাসদাসীর হাট উঠে গেল (১৮৪৩), ও নানারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে।" (১২)

এখানে জানা গেল, ইংরেজ বণিক রাজাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে 'বাবুসমাজ' ও 'ভদ্দরলোক' নামে নতুন একটি নাগরিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। এদের মধ্যে ভদ্রলোক নামে নাগরিক সমাজটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বদেশের অধঃপতিত, স্থবির ও স্তব্ধ জীবনকে উন্নত ও গতিদান করতে এগিয়ে এলো। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে এঁরা ধর্ম, সমাজ, দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুপথে চালিত করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন, বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি কি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ফল? প্রাক্ উনিশ শতকে কি স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব ছিল না? আমরা বলব, বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার রূপ দু'টি। যথা;—প্রাক্ উনিশ শতকীয় স্বদেশভাবনা বা আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনা ও উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বা বাঙালীর আত্ম-জাগরণ প্রভাবিত স্বদেশ ভাবনা। জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে বা স্বদেশে মানবসম্পদ বৃদ্ধি করতে শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালীর যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, তাকে উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বলা চলে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে শুধুমাত্র প্রাক্ উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বা বাঙালীর আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে। বাঙালীর আত্মরক্ষা মূলক স্বদেশ ভাবনা প্রাক্ উনিশ শতকেরই ভাবনা। এখন প্রশ্ন, প্রাক্ উনিশ শতক বলতে কোন সময়কাল ধরা হয়েছে? প্রাক্ উনিশ শতক বলতে যদি প্রাচীন যুগ ও সমগ্র মধ্যযুগকে নির্দেশ করি, তাহলে বাঙালীর আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনাটি আরো স্পষ্ট হবে।

নরেন্দ্র শশাঙ্কের (খ্রীষ্টিয় ৬০৬—৬৩৭) মৃত্যুর পরে প্রাচীন বাঙালী সমাজে রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। সেই সুযোগে দেখা দেয় অরাজকতা। কিন্তু এভাবে একটি রাজ্য বেশীদিন চলতে পারে না। প্রজা সাধারণ নিজেরা শান্তিতে বসবাস করার জন্য গোপালকে শাসক হিসাবে নির্বাচন করে। এবিষয়ে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন;—"প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল (৭৫০—৭৭০)।" (১৩) নির্বাচিত শাসকের সুশাসনে সে যাত্রায় বাঙালী সমাজ রক্ষা পায়। প্রসঙ্গত অতুল সুরের লেখা 'বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' রচনাটির কথা মনে পড়ে। তাঁর ভাষায়;—

"অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মদনপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একই রাজবংশের ক্রমান্বয়ে চারশ বছর রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা।" (১৪)

অতএব জনসাধারণের দ্বারা গোপালের নির্বাচনকে আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এদিকে মধ্যযুগেও তুর্কি আক্রমণের পরে বাংলায় অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে এদেশ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, সে বিষয়ে অতুল সুর লিখেছেন;—

"সেনবংশের লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয় বাঙলায় বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তিও মঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মান্তর-করণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হত না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল।" (১৫)

সে দিন স্বদেশ হিতৈষীগণ ভাবলেন কি উপায়ে দেশ ও দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যায়। এই ভাবনার শীর্ষব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। তিনি আবির্ভূত হয়ে মানবতার বাণী প্রচার করে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করলেন। 'শ্রীচৈতন্য ও সামাজিক বিস্ফোরণ' প্রবন্ধে অতুল সুর বলেন —

"তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বাঙালীর সমাজজীবনের এক অতি সঙ্কটময়কালে। ...তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, হিন্দুসমাজকে এই অত্যাচার ও অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য চাই হিন্দুর মনে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার। উপলব্ধি করেছিলেন এই আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের একমাত্র উপায় এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী গঠিত করে হরি সংকীর্তন দ্বারা জনসাধারণের মনে ঈশ্বর প্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করা। সেজন্য তিনি গঠিত করেছিলেন এক ঈশ্বরপ্রেমী বৈষ্ণবগোষ্ঠী।...সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যের ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজকে অবক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ...চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ। বাঙালীর চিন্তাধারাকে চৈতন্যের ধর্মই প্রথম আধুনিকতার দিকে প্রবাহিত করেছিল।" (১৬)

বলাবাহুল্য, মানবতার বাণী প্রচারের দ্বারা দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা চৈতন্যদেবের মহৎ ও বৃহৎ স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

বাঙালী সমাজের আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার আরো একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক নীতির অন্যতম বিষময় ফল অর্থনৈতিক শোষণ। পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার নবাবের হাত থেকে

ক্ষমতালাভ করে ইংরেজ বণিক রাজারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করে। প্রথমেই এরা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (১৭৬৫) প্রবর্তন করে শোষণের মাত্রাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। এদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় গ্রামকেন্দ্রিক বা গ্রাম্য সমাজের আত্মনির্ভরতা ধ্বংস হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশীয় কৃষক ও শিল্পী সমাজ। বক্তব্যের সমর্থনে অতুল সুরের 'বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ' প্রবন্ধের রচনাংশ উল্লেখ করা যায় —

> "দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে বাঙলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে এদেশকে কাঁচামালের আড়তে পরিণত করতে। দেওয়ানী পাবার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কাউনসিলকে আদেশ দেয়—'বাঙলার রেশম-বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হোক।' শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগে। আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলায় এনে বেচতে লাগে। বাঙলা ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ে।
>
> কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ায়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা তো এখানে লেগেই আছে, সুতরাং যে বৎসর ভাল শস্য উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হত।" (১৭)

বিদেশী শাসকের এ জাতীয় দায়িত্ব জ্ঞানহীন শোষণ ও শাসনের ফলে সম্পদ পাহাড়ী নদীর মতো এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে যেতে লাগল।

অতএব বণিক রাজপুরুষদের শাসন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই কলঙ্কমুক্ত ছিল না। তারই ফলে বৃটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে অষ্টাদশ শতকে মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা গিয়েছিল। এদেশে বণিক রাজত্বের প্রথম থেকে কিছু দেশীয় হিন্দু বাঙালী যারা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল, পরবর্তীকালে তারা এবং শাসন কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী আধো ইংরেজী জানা দেশীয় হিন্দু বাঙালী অতি সম্পদশালী হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের বিরোধিতা করে নি। এরা বণিক রাজাদের সুদিনে-দুর্দিনে পাশে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব দেশীয় মধ্যবিত্ত সমাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরোধিতা না করলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অগণিত কৃষক ও শ্রমিক শোষক বৃটিশ রাজপুরুষের বিরোধিতা করেছিল। অর্থাৎ উনিশ শতকের আগেই শিক্ষিত ও সচেতন সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়াই শোষিত কৃষক ও শিল্পী সমাজ আত্মরক্ষার তাগিদে বিদ্রোহী হয়েছিল।

বৃটিশ বণিকরাজের কল্যাণে যখন একদিকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়, ঠিক এমন সময় বণিক রাজপুরুষদের শোষণে কুটীর-শিল্পী ও আপামর কৃষকের দেওয়ালে

পিঠ ঠেকে। ১১৭৬—এর দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। এটা আর কিছু নয়—সম্পূর্ণ বৃটিশ বণিক রাজের অমানবিক শোষণের ফল। এই মন্বন্তরের পটভূমিতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩—১৮০০) ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যারা গ্রামের স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে এতদিন বসবাস করত, তারাও পেটের দায়ে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের মাত্রাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। প্রাক্ উনিশ শতকেই বাংলায় আরো অনেক জায়গায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অথবা তার কর্মচারী কিংবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিযুক্ত জমিদার প্রভৃতির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেমন;—চাক্মা বিদ্রোহ (১৭৭৬—১৭৭৭) কার্পাস কর দেবার প্রতিবাদে সংঘটিত হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণার কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে স্থানীয় শাসক নির্বাচন করে। এই শাসক অনেক জনহিতকর কাজ করেছিল। এছাড়া মেদিনীপুরের ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩), গারো হাজরাদের হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯৯), অষ্টাদশ শতকের শেষে নদীয়ায় তাঁতীদের উপর ইংরেজ বণিকের অত্যাচার ও শোষণের ফলে তন্তুবায় বিদ্রোহ (১৭৭৮) প্রভৃতি। অতএব অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজপুরুষদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অমানবিক শোষণ-শাসনে অত্যাচারিত কৃষক ও শিল্পী সমাজই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, আত্মরক্ষার তাগিদে। সুতরাং বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্য থেকে আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব বলা যায় প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, নারী-পুরুষে ভেদাভেদ, ধর্ম আচার-আচরণ সর্বস্ব ও শাসকের ভোগবিলাস, অমানবিক শোষণ এবং নিপীড়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনাহীন এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঙালী কোনরকমে বেঁচে ছিল। ঠিক এমন সময় উনিশ শতকের মধ্যভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ইংরেজ জাতি এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা (১৭৫৭) হয়। সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে কেউ কেউ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জেনে স্বদেশের অধঃপতন রোধের পরিকল্পনা করেন। এই সংকীর্ণ সমাজে একে একে আবির্ভূত হন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগচিন্তা নায়কগণ। এঁদের আবির্ভাবে রচিত হয় নতুন যুগে বাঙালীর নতুন ইতিহাস।

আমরা বলব এই সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি পটপরিবর্তনের ফলে এদেশের চিরাচরিত সংকীর্ণতা মোচনের একটা সম্ভাবনা তৈরী হয়। এই সম্ভাবনার অমর সাক্ষী উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তার মহৎ ও বৃহৎ কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে রস, রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন পায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মূলত পয়ার-ত্রিপদীধর্মী ছন্দের শৃঙ্খলে কাব্য সাহিত্য চর্চা ও ধর্ম নির্ভর কাব্য সাহিত্য চর্চার স্থানে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, সাহিত্যিক মহাকাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প আধুনিক সাহিত্যের নানা প্রকরণ ও ক্রমশ

মানবকথায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। উনিশ শতকে উল্লিখিত প্রত্যেক সাহিত্য প্রকরণে বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নের একটি উদ্যোগ চোখে পড়ে। জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নের এই উদ্যোগকে আমরা 'উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' বলতে চেয়েছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা হবে।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড,সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৬২।

২। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪২-২৪৩।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫

৪। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন, ১৪০৪, নবপত্র প্রকাশন, পৃ: ৮৫৮।

৫। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪৬-২৪৭।

৬। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৪২৯।

৭। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪৮।

৮। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ১১২।

৯। নবাবী আমল, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৫৯।

১০। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ৪৯৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯৯।

১২। বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ২৮২।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

১৫। গৌড়চন্দ্রিকা, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ১২।

১৬। শ্রীচৈতন্য ও সামাজিক বিস্ফোরণ, বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, ডঃ অতুল সুর, First Published : ১৯৯০, B. S. ১৩৯৭, Reprinted : ১৯৯১, B. S. ১৩৯৮, জ্যোৎস্নালোক, পৃ: ৭১-৭৫।

১৭। বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ২৮১-২৮২।